উপন্যাস

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১. ব্যোমকেশ সরকারী কাজে কটকে গিয়াছিল 2

০২. শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী 28

০১. ব্যোমকেশ সরকারী কাজে কটকে গিয়াছিল

ব্যোমকেশ সরকারী কাজে কটকে গিয়াছিল, আমিও সঙ্গে ছিলাম। দুচার দিন সেখানে কাটাইবার পর দেখা গেল, এ দু'চার দিনের কাজ নয়, সরকারী দপ্তরের পর্বতপ্রমাণ দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া সত্য উদঘাটন করিতে সময় লাগিবে। তখন ব্যোমকেশ কটকে থাকিয়া গেল, আমি কলিকাতায় সুপ্রিয়া আসিলাম। বাড়িতে একজন পুরুষ না থাকিলে বাঙালী গৃহস্থের সংসার চলে কি করিয়া?

কলিকাতায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছি। ব্যোমকেশ নাই, নিজেকে একটু অসহায় মনে হইতেছে। শীত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বেলা ছোট হইতেছে; তবু সময় কাটিতে চায় না। মাঝে মাঝে দোকানে যাই, প্রভাতের কাজকর্ম দেখি, নূতন পাণ্ডুলিপি আসিলে পড়ি। কিন্তু তবু দিনের অনেকখানি সময় শূন্য পড়িয়া থাকে।

তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা কাটাইবার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল।

আমাদের বাসাবাড়িটা তিনতলা। উপরতলায় গোটা পাঁচেক ঘর লইয়া আমরা থাকি, মাঝের তলার ঘরগুলিতে দশ-বারো জন চাকুরে ভদ্রলোক মেস করিয়া আছেন। নীচের তলায় ম্যানেজারের অফিস, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, কেবল কোণের একটি ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি আছে, কিন্তু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই।

সেদিন সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া একটা মাসিকপত্র লইয়া বসিয়াছি, দ্বারে টোকা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বিনীত হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে আগে দু'একবার বাসাবাড়ির দ্বিতলে দেখিয়াছি, কিছুদিন হইল মেসে বাসা লইয়াছেন। দ্বিতলের এক কোণে সেরা ঘরটি ভাড়া লইয়া একাকী বাস করিতেছেন। একটু শৌখিন গোছের লোক, সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবির উপর গরম জবাহর-কুর্তা, মাথার চুল পাকার চেয়ে কাঁচাই বেশি। ফিট্‌ফট চেহারা।

যুক্ত করে নমস্কার করিয়া বলিলেন 'মাপ করবেন, আমার নাম ভূপেশ চট্টোপাধ্যায়, দোতলায় থাকি।'

বলিলাম, আপনাকে কয়েকবার দেখেছি। নাম জানতাম না। আসুন।'

ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তিনি বলিলেন, 'মাস দেড়েক হল কলকাতায় এসেছি, বীমা কোম্পানিতে কাজ করি, কখন কোথায় আছি কিছু ঠিক নেই। হয়তো কালই অন্য কোথাও বদলি করে দেবে।'

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিলাম, আপনি বীমা কোম্পানির লোক! কিন্তু আমি তো কখনো জীবনবীমা করাইনি, কারাবার পরিকল্পনাও নেই।'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'না না, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি বীমা কোম্পানির অফিসে কাজ করি বটে, কিন্তু দালাল নই। আমি এসেছিলাম—? একটু অপ্রস্তুতভাবে থামিয়া বলিলেন, 'আমার ব্রিজ খেলার নেশা আছে। এখানে এসে অবধি খেলতে পাইনি, পেট ফুলছে। অতি কষ্টে দু'টি ভদ্রলোককে যোগাড় করেছি। তাঁরা দোতলায় তিন নম্বর ঘরে থাকেন। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন কটগ্রেট ব্রিজ খেলে কাটালাম , কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে। আজ ভাবলাম দেখি যদি অজিতবাবুর ব্রিজ খেলার শখ থাকে।'

এক সময় ব্রিজ খেলার শখ ছিল। শখ নয়, প্রচণ্ড নেশা। অনেকদিন খেলি নাই, নেশা মরিয়া গিয়াছে। তবু মনে হইল সঙ্গিহীনভাবে নীরস পত্রিকা পড়িয়া সন্ধ্যা কাটানোর চেয়ে বরং ব্রিজ ভাল।

বলিলাম, 'বেশ তো, বেশ তো। আমার অবশ্য অভ্যাস ছেড়ে গেছে, তবু— মন্দ কি।'

সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

বলিলাম, 'আপনি এগোন, আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।'

তিনি বলিলেন, 'না না, আমার ঘরেই চা খাবেন। —চলুন।'

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া হাসি পাইল। এক কালে আমারও এমনি আগ্রহ ছিল, সন্ধ্যার সময় ব্রিজ না খেলিলে মনে হইত দিনটা বৃথা গেল।

উঠিয়া পড়িলাম। সত্যবতীকে জানাইয়া ভূপেশবাবুর সঙ্গে নীচে নামিয়া চলিলাম।

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দ্বিতলের প্রথম ঘরটি ভূপেশবাবুর। নিজের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁক দিলেন, 'রামবাবু, বনমালীবাবু, আপনারা আসুন। অজিতবাবুকে পাকড়েছি।'

বারান্দার মধ্যস্থিত তিন নম্বর ঘরের দ্বার হইতে দু'টি মুণ্ড উঁকি মারিল, তারপর 'আসছি বলিয়া শঙ্কয়া গেল। ভূপেশবাবু আমাকে ইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আলো জ্বলিয়া ভূপেশবাবুর ঘরটি বেশ সুপরিসর। বাহিরের দিকের দুই দেয়ালে দু'টি গরাদযুক্ত জানালা। ঘরের এক পাশে তক্তপোশের উপর সুজুনি-ঢাকা বিছানা, অন্য পাশে খালি আলমারির মাথায় ঝকঝকে স্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি। ঘরের মাঝখানে একটি নীচু টেবিল ঘিরিয়া চারখানি চেয়ার, স্পষ্টই বোঝা যায় তাস খেলিবার টেবিল। তা ছাড়া ঘরে ড্রেসিং টেবিল, কাপড় রাখার দেরাজ প্রভৃতি যে-কয়টি ছোটখাটো আসবাব আছে সমস্তাই সুরুচির পরিচায়ক। ভূপেশবাবুর রুচি একটু বিলাত-ঘেঁষা।

ভূপেশবাবু আমাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই, পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে যাবে।

তিনি স্টেভ জ্বলিয়া জল চড়াইলেন। ইতিমধ্যে রামবাবু ও বনমালীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্বে পরিচয় থাকিলেও ভূপেশবাবু আর একবার পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি রামচন্দ্র রায়, আর ইনি বনমালী চন্দ। দু'জনে একই ঘরে থাকেন এবং একই ব্যাঙ্কে কাজ করেন।'

আমি লক্ষ্য করিলাম, আরো ঐক্য আছে; একসঙ্গে দু'জনকে কখনো দেখি নাই বলিয়াই বোধ হয় লক্ষ্য করি নাই। দু'জনেরই বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে, দু'জনেরই মোটাসোটা মাঝারি দৈর্ঘ্যের চেহারা, দু'জনেরই মুখের ছাঁচ একরকম; মোটা নাক, বিরল ভুরু, চওড়া চিবুক। সাদৃশ্যটা স্পষ্টই বংশগত। আমার লোভ হইল ইহাদের চমক লোগাইয়া দিই। হাজার হোক, আমি ব্যোমকেশের বন্ধু।

বলিলাম, আপনারা কি মাসতুত ভাই?

দু'জনে চমকিয়া চাহিলেন; রামবাবু ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, 'না। আমি বৈদ্য, বনমালীবাবু কায়স্থ।'

অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। আমতা আমতা করিয়া কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিতেছি, ভূপেশবাবু এক প্লেট শিঙাড়া আনিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। তারপর চা আসিল।

তাড়াতাড়ি চা-পর্ব শেষ করিয়া আমরা খেলিতে বসিলাম। মাসতুত ভাই-এর প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

খেলিতে বসিয়া দেখিলাম। এতদিন পরেও ব্রিজ খেলা ভুলি নাই; খেলার এবং ডাকের কলাকৌশল সবই আয়ত্তের মধ্যে আছে। সামান্য বাজি রাখিয়া খেলা, খেলার শেষে বড়জোর চার আনা লাভ লোকসান থাকে। কিন্তু এই বাজিটুকু না থাকিলে খেলার রস জমে না।

প্রথম রাবারে আমি ও রামবাবু জুড়িদার হইলাম। রামবাবু একটি মোটা চুরুট ধরাইলেন; ভূপেশবাবু ও আমি সিগারেট জ্বলিলাম, বনমালীবাবু কেবল সুপুরি-লবঙ্গ মুখে দিলেন।

তারপর খেলা চলিতে লাগিল। একটা রাবার শেষ হইলে তাস কাটিয়া জুড়িদার বদল করিয়া আবার খেলা চলিল। এঁরা তিনজনেই ভাল খেলোয়াড়; কথাবার্তা বেশি হইতেছে না, সকলের মনই খেলায় মগ্ন। কেবল সিগারেট ও সিগারের আগুন আনিবাণ জ্বলিতেছে। ভূপেশবাবু এক সময় উঠিয়া গিয়া জানোলা খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে আসিয়া বসিলেন।

খেলা শেষ হইল তখন রাত্রি নটা বাজিয়া গিয়াছে, মেসের চাকর দু'বার খাওয়ার তাগাদা দিয়া গিয়াছে। হারজিতের অঙ্ক কষিয়া দেখা গেল, আমি দুই আনা জিতিয়াছি। মহানন্দে জিতের পয়সা পকেটস্থ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভূপেশবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, কাল আবার বসবেন তো?'

বলিলাম, 'বসব।'

উপরে আসিয়া সত্যবতীর কাছে একটু বকুনি খাইলাম। শীত ঋতুতে রাত্রি সওয়া নটা কম নয়। কিন্তু অনেকদিন পরে ব্রিজ খেলিয়া মনটা ভরাট ছিল, সত্যবতীর বকুনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম।

অতঃপর প্রত্যহ আমাদের তাসের আড্ডা বসিতে লাগিল; ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভা বসে, রাত্রি নটা পর্যন্ত চলে। পাঁচ-ছয় দিনে এই তিনটি মানুষ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিল। ভূপেশবাবু সহৃদয় মিষ্টভাষী অতিথিবৎসল, ব্রিজ খেলার প্রতি গাঢ় অনুরাগ। রামবাবু একটু গভীর প্রকৃতির; বেশি কথা বলেন না, কেহ খেলায় ভুল করিলে তর্ক করেন না। বনমালীবাবু রামবাবুকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার অনুকরণে ভারিক্কি হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। দু'জনেই অল্পভাষী; তাস খেলার প্রতি গভীর আসক্তি। দু'জনেরই কথায় সামান্য পূর্ববঙ্গের টান আছে।

ছয় দিন আনন্দে তাস খেলিতেছি, আমাদের আড্ডা একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নীচের তলায় একটি মারাত্মক ব্যাপার ঘটিয়া আমাদের সভাটিকে টলমল করিয়া দিল। নীচের তলার একমাত্র বাসিন্দা নটবর নস্কর হঠাৎ খুন হইলেন। তাঁহার সহিত অবশ্য আমাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু মাঝগঙ্গা দিয়া জাহাজ যাইলে তাহার ঢেউ তীরে আসিয়া লাগে।

সেদিন-সাড়ে ছাঁটার সময় একটি র্যাপার গায়ে জড়াইয়া আমি আড্ডায় যাইবার জন্য বাহির হইলাম। আমার একটু দেরি হইয়া গিয়াছে, তাই সিঁড়ি দিয়া চটি ফটফটু করিয়া তাড়াতাড়ি নামিতেছি। শেষের ধাপে পৌঁছিয়ছি। এমন সময় দুম করিয়া একটি শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শব্দটা কোথা হইতে আসিল ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। রাস্তায় হয়তো মোটর ব্যাক-ফায়ার করিয়াছে, কিন্তু বেশ জোর আওয়াজ। রাস্ত হইতে এত জোর আওয়াজ আসিবে না।

ক্ষণকাল থামিয়া আমি আবার নামিয়া ভূপেশবাবুর ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দেখিলাম ভূপেশবাবু পাশের দিকের জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে কিছু দেখিতেছেন, রামবাবু ও বনমালীবাবু তাঁহার পিছন হইতে জানোলা দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি যখন প্রবেশ করিলাম, তখন ভূপেশবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিতেছেন, ‘ঐ-ঐ-গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান–’

আমি পিছন হইতে বলিলাম, ‘কি ব্যাপার?’

সকলে ভিতর দিকে ফিরিলেন। ভূপেশবাবু বলিলেন, ‘আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন? এই জানালার নীচের গলি থেকে এল। সবেমাত্র জানালাটি খুলেছি অমনি নীচে দুম করে শব্দ। গলা বাড়িয়ে দেখলাম একটা লোক তাড়াতাড়ি গলি থেকে বেরিয়ে গেল।’

আমাদের বাসাবাড়িটি সদর রাস্তার উপর। বাড়ির পাশ দিয়া একটি ইট-বাঁধানো সরু কানা গলি বাড়ির খিড়কির সহিত সদর রাস্তার যোগসাধন করিয়াছে; বাসার চাকর-বাকির সেই পথে যাতায়াত করে। আমার একটু খটকা লাগিল। বলিলাম, 'এই ঘরের নীচের ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর ঘর থেকে শব্দটা আসেনি তো?'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'কি জানি। আমার ঘরের নীচে এক ভদ্রলোক থাকেন বটে, কিন্তু তাঁর নাম জানি না।

রামবাবু ও বনমালীবাবু মুখ তাকোতাকি করিলেন, তারপর রামবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, নীচের ঘরে থাকেন নটবর নস্কর।'

বলিলাম, 'চলুন। তিনি যদি ঘরে থাকেন, বলতে পারবেন কিসের আওয়াজ।'

ওঁদের তিনজনের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আমি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের বন্ধু, আমি শব্দের মূল অনুসন্ধান না করিয়া ছাড়িব কেন? বলিলাম, চলুন, চলুন, একবারটি দেখে এসেই খেলায় বসা যাবে। শব্দটি যদি স্বাভাবিক শব্দ হতো তাহলে কথা ছিল না, কিন্তু গলি দিয়ে একটা লোক এসে যদি নটবরবাবুর ঘরে চীনে-পাটুকা ছুঁড়ে থাকে তাহলেও তো খোঁজ নেওয়া দরকার।'

অনিচ্ছাভরে তিনজন আমার সঙ্গে চলিলেন।

নীচের তলায় ম্যানেজার শিবকালীবাবুর অফিসে তালা ঝুলিতেছে, স্টোর-রুমের দ্বারাও বন্ধ। ভোজনকক্ষটি খোলা আছে, কারণ সেখানে কয়েকটি কাঠের পিড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। কেবল নটবরবাবুর দরজা ভেজানো রহিয়াছে, বাহিরে তালা লাগানো নাই। সুতরাং তিনি ঘরেই আছেন। এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। আমি ডাক দিলাম, নটবরবাবু!'

সাড়া নাই। আর একবার অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়াও যখন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন আমি আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিলাম। দরজা একটু ফাঁক হইল।

ঘর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না; কিন্তু একটা মৃদু গন্ধ নাকে আসিল। বারুদের গন্ধা! আমরা সচকিত দৃষ্টি বিনিময় করিলাম।

ভূপেশবাবু বললেন, 'দোরের পাশে নিশ্চয় আলোর সুইচ আছে। দাঁড়ান, আমি আলো জ্বালছি।'

তিনি আমাকে সরাইয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিলেন, তারপর হাত বাড়াইয়া সুইচ খুঁজতে লাগিলেন। কট্ করিয়া শব্দ হইল, আলো জ্বলিয়া উঠিল।

মাথার উপর বিদ্যুতের নির্মম আলোকে প্রথম যে বস্তুটি চোখে পড়িল তোহা নটবরবাবুর মৃতদেহ। তিনি ঘরের মাঝখানে হাত-পা ছড়াইয়া চিত হইয়া পড়িয়া আছেন; পরিধানে সাদা সোয়েটার ও ধুতি। সোয়েটারের বুকের নিকট হইতে গাঢ় রক্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে।

নটবর নস্কর জীবিত অবস্থাতেও খুব সুদর্শন পুরুষ ছিলেন না, দোহারা পেটমোটা গোছের শরীর, হামদো মুখে গভীর বসন্তের দাগ, কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার মুখখানা আরো বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। সে বীভৎসতার বর্ণনা দিব না। মৃত্যুভয় যে কিরূপ কুৎসিত আবেগ তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোঝা যায়।

কিছুক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবার পর রামবাবু গলার মধ্যে হেঁচুকি তোলার মত শব্দ করিলেন। দেখিলাম তিনি মোহাবিষ্ট অবিশ্বাস-ভরা চোখে মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া আছেন। বনমালীবাবু হঠাৎ তাঁহার একটা হাত খামচাইয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ‘দাদা, নটবর নস্কর মরে গেছে।’ তাঁহার অভিব্যক্তি দুঃখের কিংবা বিস্ময়ের কিংবা আনন্দের ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

ভূপেশবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, ‘মরে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। বন্দুকের গুলিতে মরেছে!— ঐ যে। ঐ যে। জানালার ওপর দেখতে পাচ্ছেন?’

গরাদ-যুক্ত জানালা খোলা রহিয়াছে, তাহার পৈঁঠার উপর একটি পিস্তল। চিত্রটি স্পষ্ট হইয়া উঠিল : জানালার বাহিরের গলিতে দাঁড়াইয়া আততায়ী নটবর নস্করকে গুলি করিল, তারপর পিস্তলটি জানালার পৈঁঠার উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময় পিছন দিকে দ্রুত পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। মেসের ম্যানেজার শিবকালী চক্রবর্তী আসিতেছেন। তাঁহার চিমড়ে চেহারা, গতি অকারণে ক্ষিপ্র, চোখের দৃষ্টি অকারণে ব্যাকুল; কথা বলিবার সময় একই কথা একাধিকবার উচ্চারণ না করিয়া

শান্তি পান না। তিনি। আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'আপনারা এখানে? এখানে? কি হয়েছে? কি হয়েছে?'

'নিজের চোখেই দেখুন'—আমরা দ্বারের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলাম। শিবকালীবাবু রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া অতিকাইয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ! এ কি-এ কি। নটবর নস্কর মারা গেছেন। রক্ত, রক্ত! কি করে মারা গেলেন?'

পিস্তল দেখিয়া শিবকালীবাবু আবার ত্রাসোক্তি করিলেন, 'অ্যাঁ–পিস্তল–পিস্তল। পিস্তলের গুলিতে নটবরবাবু খুন হয়েছেন! কে খুন করেছে–কখন খুন করেছে?'

বলিলাম, 'কে খুন করেছে জানি না, কিন্তু কখন খুন করেছে বলতে পারি। মিনিট পাঁচেক আগে।'

সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিলাম। তিনি ব্যাকুল নেত্রে মৃতদেহের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, হঠাৎ চোখে পড়িল, শিবকালীবাবুর গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বুকের ধড়ফড়ানি দমন করিয়া বলিলাম, 'আপনি কি বাসায় ছিলেন না? বেরিয়েছিলেন?'

তিনি উদভ্রান্তভাবে বলিলেন, 'অ্যাঁ–আমি কাজে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু–কিন্তু—এখন উপায়? কর্তব্য কী-কর্তব্য?'

বলিলাম, 'প্রথম কর্তব্য পুলিসকে খবর দেওয়া।'

শিবকালীবাবু বলিলেন, 'তাই তো, তাই তো। ঠিক কথা— ঠিক কথা! কিন্তু আমার তো টেলিফোন নেই। অজিতবাবু, আপনাদের টেলিফোন আছে, আপনি যদি–

আমি বলিলাম, 'এখনি পুলিসকে টেলিফোন করছি। — আপনারা কিন্তু ঘরে ঢুকবেন না, যতক্ষণ না পুলিস আসে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলাম।। ঘরে প্রবেশ করিতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব চোখে পড়িল। আমার গায়েও বাদামী রঙের আলোয়ান।

আমাদের পাড়ার তৎকালীন দারোগা প্রণব গুহ মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল। কর্মপটু বয়স্থ লোক, কিন্তু ব্যোমকেশের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। অবশ্য তাঁহার প্রসন্নতা কোনো প্রকার বাক-পারুষ্য বা রূঢ়তার মাধ্যমে প্রকাশ পাইত না, ব্যোমকেশকে তিনি অতিরিক্ত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক কথা বলিয়া কথার শেষে অনুচ্চস্বরে একটু হাসিতেন। বোধ হয় দুইজনের মনের ধাতুগত বিরোধ ছিল; তা ছাড়া সরকারী কার্যকলাপে বে-সরকারী স্কুল হস্তাবলোপ প্রণববাবু পছন্দ করিতেন না।

টেলিফোনে আমার বাত শুনিয়া তিনি ব্যঙ্গভরে বলিলেন, 'বলেন কি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সর্ষের মধ্যে ভূত! তা ব্যোমকেশবাবু যখন রয়েছেন তখন আমাকে আর কী দরকার? তিনিই তদন্ত করুন।'

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'ব্যোমকেশ কলকাতায় নেই, থাকলে অবশ্য করত।'

প্রণব দারোগা বলিলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি যাচ্ছি।' খিক্ খিক্ হাস্য করিয়া তিনি ফোন রাখিয়া দিলেন। আমি আবার নীচের তলায় নামিয়া গেলাম।

আধা ঘণ্টা পরে প্রণববাবু দলবল লইয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া খিক্ খিক্ হাসিলেন , তারপর গভীর হইয়া লাশ। তদারক করিলেন। জানালা হইতে পিস্তলটি রুমালে জড়াইয়া সন্তর্পণে পকেটে রাখিলেন। অবশেষে লাশ চালান দিয়া ঘরের একটি মাত্র চেয়ারে বসিয়া বাসার সকলকে জেরা আরম্ভ করিলেন।

আমি যাহা জানিতাম বলিলাম। বাকি সকলের বয়ান সংক্ষেপে লিখিতেছি।–

ম্যানেজার শিবকালীবাবু ব্রহ্মচারী ব্রতধারী পুরুষ, অর্থাৎ অবিবাহিত। পাঁচশ বছর ধরিয়া মেস চালাইতেছেন, সেই মেসই তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরিবার।...নটবর নস্কর প্রায় তিন বছর পূর্বে নীচের তলার এই ঘরটিতে বাসা বাঁধিয়াছিলেন, তদবধি এখানেই ছিলেন। তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশ, কাহারো সহিত বেশি মেলামেশা ছিল না। রামবাবু এবং বনমালীবাবু কালেভদ্রে তাঁহার ঘরে আসিতেন। শিবকালীবাবুর সহিত নটবর নস্করের

অপ্রীতি ছিল না, কারণ নটবর প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মেসের পাওনা চুকাইয়া দিতেন।–শিবকালীবাবু আজ বিকালে খবর পাইয়াছিলেন যে, কোনো এক গুদামে সস্তায় আলু পাওয়া যাইতেছে, তাই তিনি আলু কিনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আলু পূর্বেই বিক্রি হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ভূপেশবাবু বীমা কোম্পানিতে চাকরি করেন, মাস দেড়েক হইল বদলি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ, বিপত্নীক, নিঃসন্তান। গৃহ বলিতে কিছু নাই, কর্মসূত্রে ভারতের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁস খেলায় দল বাঁধা এবং আজ সন্ধ্যার ঘটনা ভূপেশবাবু যথাযথ বর্ণনা করিলেন, বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটারও উল্লেখ করিলেন। লোকটার মুখ তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, অপসারণশীল মানুষের মুখ পিছন হইতে দেখা যায় না; ভবিষ্যতে তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিকেন এমন সম্ভাবনা কম।

রামচন্দ্র রায় ও বনমালী চন্দের এজাহার প্রায় একই প্রকার। লক্ষ্য করিলাম, রামবাবু ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিলেও বনমালীবাবু একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা পূর্বে ঢাকায় ছিলেন, একসঙ্গে একটি বিলাতি কোম্পানিতে চাকরি করিতেন। দেশ বিভাগের হাঙ্গামায় তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার সকলেই নিহত হয়, তাঁহারা অতি কষ্ট্রে গুণ লইয়া পলুইয়া আসেন। রামবাবুর বয়স আটচল্লিশ, বনমালীবাবুর পয়তাল্লিশ। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া এই মেসে আছেন এবং একটি ব্যাঙ্কে কাজ করিতেছেন। এইভাবে তিন বছর কাটিয়াছে।

তাঁহাদের ব্রিজ খেলার শখ আছে, কিন্তু কলিকাতায় আসার পর খেলার সুযোগ হয় নাই। কয়েকদিন আগে ভূপেশবাবু নিজের ঘরে ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সেই অবধি বেশ আনন্দে সন্ধ্যা কাটিতেছিল। তারপর আজ তাঁহারা ভূপেশবাবুর ঘরে পদার্পণ করিবার পাঁচ মিনিট পরে হঠাৎ গলির মধ্যে দুম করিয়া আওয়াজ হইল!–নটবরবাবুর সহিত তাঁহাদের ঢাকায় আলাপ ছিল; সামান্য আলাপ, বেশি ঘনিষ্ঠতা নয়। নটবরবাবু ঢাকায় নানাপ্রকার দালালির কাজ করিতেন। এখানে একই মেসে থাকার জন্য তাঁহাদের মাঝে-মধ্যে দেখাশোনা হইত; রামবাবু ও বনমালীবাবু এই ঘরে আসিয়া গল্পসল্প করিতেন। নটবরবাবুর অন্য কোন বন্ধুবান্ধব আছে কিনা তাঁহারা জানেন না।–বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটাকে তাঁহারা গলির মোড়ে সন্ধ্যার আবছায়া আলোয় পালকের জন্য দেখিয়াছিলেন, আবার দেখিলে চিনিতে পারিবেন না।

মেসে অন্য যাঁহারা থাকেন তাঁহারা কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। দ্বিতলের অন্য প্রান্তে একটি ঘরে পাশার আডডা বসিয়াছিল; চারজন খেলুড়ে এবং আরো গুটিচারেক দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পান নাই। মেসের কাহারো সঙ্গে নটবরবাবুর সামান্য মুখ চেনাচেনি ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কেবল মেসের ভৃত্য হরিপদ একটা কথা বলিল যাহা অবান্তর হইতে পারে আবার অর্থপূর্ণ হইতে পারে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় দ্বিতলের সুরেনবাবু হরিপদকে পাঠাইয়াছিলেন মোড়ের হোটেল হইতে আলুর চাপ কিনিয়া আনিতে। চপ কিনিয়া খিড়কির পথে ফিরিবার সময় হরিপদ শুনিতে পাইয়াছিল, নটবরবাবুর ঘরে কেহ আসিয়াছে এবং মৃদুগুঞ্জনে কথা বলিতেছে। নটবরবাবুর দরজা ভেজানো ছিল বলিয়া ঘরের ভিতর কে

আছে হরিপদ দেখিতে পায় নাই; গলার স্বরও চিনিতে পারে নাই। নটবরবাবুর ঘরে কেহ বড় একটা আসে না, তাই হরিপদ বিশেষ করিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সময় সম্বন্ধে সে স্পষ্টভাবে কিছু বলিতে পারিল না, তবে সুরেনবাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, তিনি সন্ধ্যা ছাঁটার সময় চাপ আনিতে দিয়াছিলেন।

অর্থাৎ মৃত্যুর আধা ঘণ্টা আগে নটবরবাবুর ঘরে লোক আসিয়াছিল। মেসের কেহ নয়, কারণ কেহই স্বীকার করিল না যে, সে নটবরবাবুর ঘরে গিয়াছিল। সুতরাং বাহিরের লোক। হয়তো বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটা। কিংবা অন্য কেহ; হরিপদর এজেহার হইতে কিছুই ধরা-ছোঁয়া যায় না।

সকলের এজেহার লিখিত হইবার পর প্রণব দারোগা বলিলেন, 'আপনারা এখন যেতে পারেন, আমরা ঘর খানাতল্লাশ করব। হ্যাঁ, অজিতবাবু এবং শিবকালীবাবুকে জানিয়ে দিচ্ছি, যতদিন খুনের কিনারা না হয়, ততদিন আপনারা আমার অনুমতি না নিয়ে কলকাতার বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

প্রণব দরোগা বলিলেন, 'তার মানে, আপনার এবং শিবকালীবাবুর গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান রয়েছে। খিক্‌খিক্।–আচ্ছা, আসুন।'

তিনি আমাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা যে যার কোটরে ফিরিয়া আসিলাম। তাস খেলার কথা মনেই রহিল না।

পরের দিনটা নিষ্ক্রিয় বৈচিত্র্যহীনভাবে কাটিয়া গেল। পুলিসের দিক হইতে সাড়াশব্দ নাই। প্রণব দরোগা গত রাত্রে নটবরবাবুর ঘর খানাতল্লাশ করিয়া দ্বারে তালা লাগাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিছু কাগজপত্র লইয়া গিয়াছেন। লোকটি আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; কিন্তু এমন মিষ্টভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন যে, কিছু বলিবার থাকে না। তিনি জানেন আমার অকাট্য অ্যালিবাই আছে, তবু তুচ্ছ ছুতা করিয়া আমার উপর কলিকাতা ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া গেলেন। আমি ব্যোমকেশের বন্ধু, তাই আমাকে উত্ত্যক্ত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সকালবেলা মেসের বাবুরা নিজ নিজ অফিসে চলিয়া গেলেন। কাহারো মনে কোনো বিকার নাই। নটবর নস্কর নামক যে মানুষটি তিন বছর মেসে ছিলেন, তিনি যে বন্দুকের গুলিতে মারা গিয়াছেন। সেজন্য কাহারো আক্ষেপ নাই। ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে’–সকলেরই এইরূপ একটি পারমার্থিক মনোভাব।

সন্ধ্যাবেলা ভূপেশবাবুর ঘরে গেলাম। রামবাবু ও বনমালীবাবুও উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেরই একটু নিস্তেজ অবস্থা। খেলার কথা আজ কেহ উল্লেখ করিল না। চা পান করিতে করিতে মনমরাভাবে নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং পুলিসের অকর্মণ্যতার নিন্দা করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে একটা আইডিয়া মাথায় আসিল। প্রণব দরোগা যত কর্মকুশলীই হোন। তাঁহার দ্বারা নটবরবাবুর খুনের কিনারা হইবে না। ব্যোমকেশ এখানে নাই; তাসের আড়া ম্রিয়মাণ, এ অবস্থায় নিষ্কমার মত বসিয়া না থাকিয়া আমি যদি ঘটনাটি লিখিয়া রাখি তাহা হইলে মন্দ হয় না। আমারো কিছু করা হইবে এবং ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া আমার লেখা পড়িলে হয়তো খুনের একটা হেস্তনেস্ত করিতে পারিবে।

রাত্রেই লিখিতে বসিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ যাহাতে খুঁত ধরিবার সুযোগ না পায় এমনিভাবে ঘটনার ভূমিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমার দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। লেখা শেষ হইল পরদিন অপরাহ্নে।

লেখা শেষ হইল বটে। কিন্তু কাহিনীটি শেষ হইল না। কবে কোথায় গিয়া নটবরবাবুর হত্যা কাহিনী শেষ হইবে কে জানে। হয়তো হত্যাকারীর নাম চিরদিন অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। একটু অপরিতৃপ্ত মন লইয়া সবেমাত্র সিগারেট ধরাইয়াছি। এমন সময় সুটকেশ হাতে গুটিগুটি ব্যোমকেশ প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিলাম, 'আরে! তুমি ফিরে এসেছ! কাজ শেষ হয়ে গেল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাজ এখনো আরম্ভই হয়নি। সরকারের দুই দপ্তরে ঝগড়া বেধে গেছে। আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকড়ি। দেখে শুনে আমি চলে এলাম। ওদের কামড়া-কামড়ি থামলে আবার যাব।'

সত্যবতী ভিতর হইতে ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল, আচিলে হাত মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিল। তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন নূতন নয়, কিন্তু এখনো ব্যোমকেশকে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পাইলে সত্যবতীর চোখে আনন্দবিহ্বল জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে।

দাম্পত্য পুনর্মিলনের পালা শেষ হইলে আমি নটবর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম এবং লেখাটি পড়িতে দিলাম। ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিতে দিতে পড়িল।

সন্ধ্যা ছটা বাজিলে সে লেখাটা আমাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'প্রণব দারোগা তোমাকে শহরবন্দী করে রেখেছে। লোকটা যে আমাদের কী চোখেই দেখেছে! কাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। চল, আজ ভুপেশীবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

বুঝিলাম ব্যোমকেশ আকৃষ্ট হইয়াছে। খুশি হইয়া বলিলাম, চল। রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।'

দ্বিতলে ভূপেশবাবুর ঘরে ব্যোমকেশকে লইয়া গেলাম। আমার অনুমান মিথ্যা নয়, রামবাবু ও বনমালীবাবু উপস্থিত আছেন। পরিচয় করাইয়া দিতে হইল না, সকলেই ব্যোমকেশের চেহারার সঙ্গে পরিচিত। ভূপেশবাবু সমাদ্দারের সহিত ব্যোমকেশকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং চায়ের জল চড়াইলেন। রামবাবুর গভীর্য অটল রহিল, কিন্তু বনমালীবাবুর চোখে ত্রস্ত সতর্কতা উকিঝুকি মারিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিল, 'আমারও এক সময় ব্রিজের নেশা ছিল। তারপর অজিত দাবা খেলতে শিখিয়েছিল। কিন্তু এখন আর খেলাধুলো ভাল লাগে না।'

ভূপেশবাবু স্টেভের উপর ফুটন্ত জলে চায়ের পাতা ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইলেন, হাসিমুখে বলিলেন, 'এখন শুধু পরাণের সাথে খেলিব আজকে মরণ খেলা।'

ভূপেশবাবুর মুখে রবীন্দ্র কাব্য শুনিয়া একটু চমকিত হইলাম। তিনি বীমার অফিসে চাকরি করেন আবার কাব্যচর্চাও করেন।

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'ঠিক বলেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে সারা জীবন খেলা করে করে এমন অবস্থা হয়েছে যে হালকা খেলায় আর মন বসে না।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমিও মৃত্যু নিয়ে কারবার করি, বীমার কাজ মৃত্যুর ব্যবসা ছাড়া আর কী বলুন? কিন্তু আমার এখনো ব্রিজ খেলতে ভাল লাগে।'

ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু রামবাবু এবং বনমালীবাবুর দিকেই ঘোরাফেরা করিতেছিল। তাঁহারা নির্বাক বসিয়াছিলেন এই ধরনের হাল্কা অথচ মার্জিত-রুচি বাক্যালাপের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই।

ভূপেশবাবু চায়ের পেয়ালা এবং ক্রিমকেকার আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। ব্যোমকেশ যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'আপনিও স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। ব্রিজ খেলা বুদ্ধির খেলা, যাদের বুদ্ধি আছে তারা স্বভাবতাই এই খেলার দিকে আকৃষ্ট হয়। কেউ কেউ জীবন-যন্ত্রণা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পাবার আশায় তাস খেলতে বসে। আমি অনেক দিন আগে একজনকে জানতাম, সে পুত্রশোক ভোলবার জন্যে ব্রিজ খেলত।'

তিনজনের চক্ষু যেন যন্ত্রচালিতবৎ ব্যোমকেশের দিকে ফিরিল। কেহ কোনো কথা বলিলেন না, কেবল বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া রহিলেন। ঘরের মধ্যে একটি গুরুভার নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল।

নীরবে চা-পান সম্পন্ন হইল। তারপর ব্যোমকেশ রুমালে মুখ মুছিয়া সহজ সুরে নীরবতা ভঙ্গ করিল, 'আমি কটকে গিয়েছিলাম, আজই বিকেলবেলা ফিরেছি। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অজিত আমাকে নটবর নস্করের মৃত্যুর খবর জানালো। নটবরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে কৌতূহল হল। নিজের দোরগোড়ায় হত্যাকাণ্ড বড় একটা দেখা যায় না। তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'ভাগ্যিস হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল। তাই আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আমি কিন্তু নটবর নস্কর সম্বন্ধে কিছু জানি না, জীবিত অবস্থায় তাকে চোখেও দেখিনি। রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল।'

ব্যোমকেশ রামবাবুর পানে তাকাইল। রামবাবুর গভীর্যের উপর যেন ঈষৎ শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। তিনি উসখুসি করিলেন, একবার গলা ঝাড়া দিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিয়া আবার মুখ বন্ধ করিলেন। ব্যোমকেশ তখন বনমালীবাবুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, 'নটবরবাবু কেমন লোক ছিলেন। আপনি নিশ্চয় জানেন?'

বনমালীবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—লোক মন্দ নয়–বেশ ভালই লোক ছিএলন—তবে–

এতক্ষণে রামবাবু বাকশক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তিনি বনমালীবাবুর অসমাপ্ত কথার মাঝখানে বলিলেন, 'দেখুন, নটবরবাবুর সঙ্গে আমাদের মোটেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে যখন ঢাকায় ছিলাম তখন নটবরবাবু পাশের বাড়িতে থাকতেন, তাই সামান্য মুখ চেনাচেনি ছিল। ওঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কতদিন আগে আপনারা ঢাকায় ছিলেন?'

রামবাবু ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'পাঁচ-ছয় বছর আগে। তারপর দেশ ভাগাভাগির দাঙ্গা শুরু হল, আমরা পশ্চিমবঙ্গে চলে এলাম।'

ব্যোমকেশ বনমালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঢাকায় আপনারা দ'জনে একই অফিসে চাকরি করতেন বুঝি?'

বনমালীবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানির নাম শুনেছেন, মস্ত বিলিতি কোম্পানি। আমরা সেখানেই—'

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই রামবাবু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'বনমালী! আজ সাতটার সময় নারায়ণবাবুর বাসায় যেতে হবে মনে আছে?–আচ্ছা, আজ আমরা উঠি।'

বনমালীকে সঙ্গে লইয়া রামবাবু দ্রুত নিস্ক্রান্ত হইলেন। ব্যোমকেশ ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাদের নিষ্ক্রমণ ক্রিয়া দেখিল।

ভূপেশবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার প্রশ্নগুলি শুনতে খুবই নিরীহ, কিন্তু রামবাবুর আঁতে ঘা লেগেছে।'

ব্যোমকেশ ভালমানুষের মত বলিল, 'কেন আঁতে ঘা লাগল বুঝতে পারলাম না। আপনি কিছু জানেন?'

ভূপেশবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কিছুই জানি না। দাঙ্গার সময় আমি অবশ্য ঢাকায় ছিলাম, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল না। ওঁদের অতীত সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।'

'দাঙ্গার সময় আপনিও ঢাকায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ। দাঙ্গার বছরখানেক আগে ঢাকায় বদলি হয়েছিলাম, দেশ ভাগ হবার পর ফিরে আসি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। ভূপেশবাবু কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি যে গল্প বললেন, পুত্রশোক ভোলবার জন্যে একজন ব্রিজ খেলত, সেটা কি সত্যি গল্প?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি গল্প। অনেক দিন আগের কথা আমি তখন কলেজে পড়তাম। কেন বলুন দেখি?'

ভূপেশবাবু উত্তর দিলেন না, উঠিয়া গিয়া দেরাজ হইতে একটি ফটোগ্রাফ আনিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিলেন। একটি নয়-দশ বছরের ছেলের ছবি; কৈশোরের লবণ্যে মুখখানি টুলটুল করিতেছে। ভূপেশবাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আমার ছেলে?'

ছবি হইতে ভূপেশবাবুর মুখের পানে উৎকণ্ঠিত চক্ষু তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ছেলে—'

ভূপেশবাবুঘাড় নাড়িলেন, 'মারা গেছে। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা শুরু হয় সেদিন স্কুলে গিয়েছিল, স্কুল থেকে আর ফিরে এল না।'

দুর্বহ মৌন ভঙ্গ করিয়া ব্যোমকেশ অধোচ্চারিত প্রশ্ন করিল, 'আপনার স্ত্রী—?'

ভূপেশবাবু বলিলেন, ‘সেও মারা গেছে। হার্ট দুর্বল ছিল, পুত্রশোক সইতে পারল না। আমি মরলাম না, ভুলতেও পারলাম না। পাঁচ ছয় বছর কেটে গেছে, এতদিনে ভুলে যাবার কথা। কিন্তু কাজ করি, তাস খেলি, হেসে খেলে বেড়াই, তবু ভুলতে পারি না। ব্যোমকেশবাবু, শোকের স্মৃতি মুছে ফেলবার কি কোনো ওষুধ আছে?

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘একমাত্র ওষুধ মহাকাল।’

০২. শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী

পরদিন সকালে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামীকে দর্শন করে আসা যাক।'

কাল রাত্রে ভূপেশবাবুর জীবনের ট্র্যাজেডি শুনিয়া মনটা ছায়াচ্ছন্ন হইয়া ছিল, প্রণব দারোগার সম্মুখীন হইতে হইবে শুনিয়া আরো দমিয়া গেলাম। বলিলাম, 'প্রণবানন্দ বাবাজিকে দর্শন করা কি একান্ত দরকার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসের সন্দেহ থেকে যদি মুক্ত হতে না চাও তাহলে দরকার নেই।

'চল।'

সাড়ে ন'টার সময় সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে নামিয়া দেখিলাম ভূপেশবাবুর দ্বারে তালা লাগানো।তিনি নিশ্চয় অফিসে গিয়াছেন। তিন নম্বর ঘর হইতে রামবাবু ও বনমালীবাবু ধড়চূড়া পরিয়া বাহির হইতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ আমার পানে চোখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নীচের তলায় শিবকালীবাবু অফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতেছিলেন, ব্যোমকেশকে দেখিতে পাইয়া লাফাইয়া দ্বারের কাছে আসিলেন, ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু!

কটক থেকে কবে এলেন— কখন এলেন? নটবর নস্করের কথা শুনেছেন তো! কি মুশকিল দেখুন দেখি, পুলিস আমাকে ধরে টানাটানি করছে— নাহিক টানাটানি করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুধু আপনাকে নয়, অজিতকে নিয়েও টানাটানি করছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো। বাদামী র‍্যাপার। মানে হয় না— মানে হয় না।— আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

'দেখি চেষ্টা করে।'

'গলিটা' মানে আমাদের বাসার পাশের গলি, যে গলি দিয়া বাদামী আলোয়ান গায়ে লোকটা নটবরবাবুকে গুলি করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলি, দুইজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটিতে পারে না।আমরা আগে পিছে গলিতে প্রবেশ করিলাম; ব্যোমকেশ ইট-বাঁধানো মেঝের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তাহার মনে কী আছে জানি না, কিন্তু তিন দিন পরে গলির মধ্যে হত্যাকারীর কোনো নিশানা পাওয়া যাইবে ইহা আশা করাও দুরাশা।

নটবরবাবুর ঘরের জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ সেইখানে গিয়া ইট-বাঁধানো জমির উপর সন্ধানী চক্ষু বুলাইতে লাগিল। জানালাটি গলি হইতে চার ফুট উচুতে অবস্থিত, কপাট খোলা থাকিলে গলিতে দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে গুলি চালানো যায়।

'ওটা কিসের দাগ?'

ব্যোমকেশের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, ঠিক জানালার নীচে ইট-বাঁধানো মেঝের উপর পাশুটে রঙের একটা দাগ রহিয়াছে; তিন ইঞ্চি ব্যাসের নক্ষত্রাকার একটা দাগ। গলিতে মাঝে মাঝে ঝাঁট পড়ে, কিন্তু সম্মার্জনীর তাড়না সত্ত্বেও দাগটা মুছিয়া যায় নাই। দুই তিন দিনের পুরানো দাগ মনে হয়।

কলিলাম, 'কিসের দাগ?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হঠাৎ গলির মধ্যে ডন ফেলার ভঙ্গীতে লম্বা হইয়া দাগের উপর নাসিক স্থাপন করিল। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ওকি! মাটিতে নাক ঘাষছ কেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'নাক ঘষিনি। শুকছিলাম।'

'শুকছিলো! কেমন গন্ধ?'

'যদি জানতে চাও তুমিও শুকে দেখতে পার।'

'আমার দরকার নেই।'

'তাহলে চল থানায়।'

গলি হইতে বাহির হইয়া থানার দিকে চলিলাম। দু'একবার ব্যোমকেশের মুখের পানে অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু রাস্তার গন্ধ শুকিয়া সে কিছু পাইয়াছে কিনা বোঝা গেল না।

থানায় প্রণব দারোগ ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চেহারা মোটের উপর জুলাই, দোহার উজ্জ্বল শামক শরীর; দোষের মধ্যে শরীরের খাড়াই মাত্র পাঁচ ফুট ভিন্ন

ব্যোমকেশকে দেখিয়া তাঁহার চোখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর ছদ্মবিনয় ভাব ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু! উঠেই আপনার মুখ দেখলাম— কী সৌভাগ্য। খিকখিক।' ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার সৌভাগ্যও কম নয়। সকালবেলা বেঁটে মানুষ দেখলে কী ফল হয় তা শাস্ত্রেই লেখা আছে—ব্রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

প্রণব দরোগ থতমত খাইয়া গেলেন। ব্যোমকেশ চিরদিন প্রণব দারোগার ব্যঙ্গ বিদ্রুপ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার মেজাজ অন্য রকম। প্রণববাবু প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত মুন্ন না, তিনি গভীর হইয়া বললেন, আমার চেহারা আকাশ পিন্ধিমের মত নয় তা স্বীকার ব্যোমকেশ হাসিল, 'স্বীকার না করে উপায় নেই। আকাশ পিন্দিমের মাথায় আলো জ্বলে; ঐখানেই আপনার সঙ্গে তফাত।'

প্রণববাবুর মুখ কালো হইয়া উঠিল, তিনি চেষ্টাকৃত কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কি করব বলুন, সকলের মাথায় তো গ্যাস-লাইট জ্বলে না।–কিছু দরকার আছে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আছে। বইকি। প্রথমত, অজিত যে ফেরারী হয়নি তার প্রমাণস্বরূপ ওকে ধরে এনেছি। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আমি ওর ওপর নজর রেখেছি, আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও পালাতে পারবে না।‘

প্রণববাবু অপ্রস্তুতভাবে হাসিবার চেষ্টা করিলেন। ব্যোমকেশ নির্দয়ভাবে বলিয়া চলিল, ‘আপনি অজিতকে শহরবন্দী করে রেখেছেন একথা শুনলে কমিশনার সাহেব কি বলবেন আমি জানি না, কিন্তু জানিবার আগ্রহ আছে। দেশে আইন আদালত আছে, জনসাধারণের স্বাধীনতার ওপর অকারণ হস্তক্ষেপ করলে পুলিস কর্মচারীরাও সাজা হতে পারে। যাহোক, এসব পরের কথা। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কিনা।’

প্রণববাবু এই প্রশ্নের রূঢ় উত্তর দিবেন। কিনা চিন্তা করিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশকে তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় ঘটানো উচিত হইবে না বুঝিয়া তিনি ধীরস্বরে বলিলেন, ‘ব্যোমকেশবাবু, এই কলকাতা শহরের জনসংখ্যা কত আপনার জানা আছে কি?’

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভারে বলিল, ‘কখনো গুনে দেখিনি, লাখ পঞ্চাশেক হবে।’ প্রণববাবু বলিলেন, ‘ধরুন পঞ্চাশ লাখ। এই অর্ধকোটি মানুষের মধ্যে থেকে বাদামী আলোয়ান গায়ে একটি লোককে ধরা কি সহজ? আপনি পারেন?’

‘সব খবর পেলে হয়তো পারি।’

'বাইরের লোককে সব খবর জানানো যদিও আমাদের রীতি বিরুদ্ধ, তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারি।'

'বেশ, বলুন! নটবর নস্করের আত্মীয়-স্বজনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি।'

'ময়না তদন্তের ফলাফল কি রকম?'

'বুকের হাড় ফুটো করে গুলি হৃদযন্ত্রে ঢুকেছে। পিস্তলের সঙ্গে গুলি মিলিয়ে দেখা গেছে, গুলি ওই পিস্তল থেকেই বেরিয়েছে।'

'আর কিছু?' শিরীর সুস্থই ছিল, কিন্তু চোখে ছানি পড়বার উপক্রম হয়েছিল।' 'পিস্তলের মালিক কে?' 'মার্কিন ফৌজি পিস্তল, কালোবাজারে কিনতে পাওয়া যায়। মালিকের নাম জানার উপায় নেই।'

'ঘর তল্লাশ করে কিছু পেয়েছেন?'

‘দরকারী জিনিস যা পেয়েছি তা ওই টেবিলের ওপর আছে। একটা ডায়েরি, গোটা পাঁচেক টাকা, ব্যাঙ্কের পাস-বুক, আর একটা আদালতের রায়ের বাজাপ্ত নকল। আপনি ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।’

ঘরের কোণে একটা টেবিল ছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া সেইদিকে গেল, আমি গোলাম না। প্রণব দারোগা লোক ভাল নয়, তিনি যদি আপত্তি করেন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ ব্যাঙ্কের খাতা পরীক্ষা করিল, ডায়েরির পাতা উল্টাইল, স্ট্যাম্প কাগজে লেখা আদালতী দলিল মন দিয়া পড়িল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ‘দেখা হয়েছে।’

প্রণব দারোগার দুষ্টবুদ্ধি এতক্ষণে আবার চাড়া দিয়াছে, তিনি মিটমিটি চাহিয়া বলিলেন, ‘আমি যা-যা দেখেছি আপনিও তাই দেখলেন। আসামীর নাম-ধাম সব জানতে পেরে গেছেন?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘হ্যাঁ, পেরেছি।’

ভ্রূ আকাশে তুলিয়া প্রণববাবু বলিলেন, ‘বলেন কি! এরি মধ্যে! আপনার তো ভারি বুদ্ধি! তা দয়া করে আসামীর নামটা আমায় বলুন, আমি তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলি?’

ব্যোমকেশ চোয়াল শক্ত করিয়া বলিল, ‘আসামীর নাম আপনাকে বলব না দারোগাবাবু; ওটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার। আপনি এই কাজের জন্যে মাইনে খান, আপনাকে নিজে

থেকে খুঁজে বার করতে হবে। তবে একটু সাহায্য করতে পারি। মেসের পাশের গলিটা খুঁজে দেখবেন।'

'সেখানে আসামী তার পদচিহ্ন রেখে গেছে নাকি! খিক্ খিক্।'

'না, পদচিহ্নের চেয়েও গুরুতর চিহ্ন রেখে গেছে।—আর একটা কথা জানিয়ে যাই। দুচার দিনের মধ্যেই আমি অজিতকে নিয়ে কটকে চলে যাব। আপনার যদি সাহস থাকে তাকে আটকে রাখুন।–চল অজিত।'

থানা হইতে বাহির হইয়া আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, 'কে আসামী, ধরতে পেরেছ?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'থানায় আসার আগেই জানতে পেরেছি, কিন্তু প্রণব দরোগা একটা ইয়ে। বুদ্ধি নেই তা নয়, বিপরীত বুদ্ধি। ও কোনো কালে নটবর নস্করের খুনীকে ধরতে পারবে না।'

প্রশ্ন করিলাম, নটবর নস্করের খুনী কে? চেনা লোক?'

'পরে বলব। আপাতত এইটুকু জেনে রাখো যে, নটবর নস্করের পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা। তুমি বাসায় ফিরে যাও, আমি অফিস-পাড়ায় যাচ্ছি। কলকাতাতেও গডফ্রে ব্রাউনের প্রকাণ্ড ব্যবসা আছে, তাদের অফিসে কিছু খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, আমার ফিরতে দেরি হবে।' হাত নাড়িয়া সে চলিয়া গেল।

আমি একাকী বাসায় ফিরিলাম। ব্যোমকেশ ফিরিল বেলা তখন দেড়টা।

স্নানাহারের পর সে বলিল, 'একটা কাজ করতে হবে; বিকেলবেলা তুমি গিয়ে রামবাবুকে , বনমালীবাবুকে এবং ভূপেশবাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করে আসবে। সন্ধ্যের পর এই ঘরে সভা বসবে।'

'তথাস্তু। কিন্তু ব্যাপার কি! গডফ্রে ব্রাউনের অফিসে গিয়েছিলে কেন?'

'থানায় নটবর নস্করের জিনিসগুলোর মধ্যে একটা আদালতের রায় ছিল। সেটা পড়ে দেখলাম রাসবিহারী বিশ্বাস এবং বনবিহারী বিশ্বাস নামে দুই ভাই গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানির ঢাকা ব্রাঞ্চে যথাক্রমে খাজাঞ্চী ও তস্য সহকারী ছিল। সাত বছর আগে তারা অফিসের টাকা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। মামলা হয় এবং বনবিহারীর দু'বছর ও রাসবিহারীর তিন বছর জেল হয়। সেই মোকদ্দমার রায় নটবর নস্কর যোগাড় করেছিল। তারপর তার ডায়েরি খুলে দেখলাম, প্রতি মাসে সে রাসবিহারী ও বনবিহারী বিশ্বাসের কাছ থেকে আশি টাকা পায়। গডফ্রে ব্রাউনের অফিসে গিয়ে চুরি-ঘটিত মামলার কথা যাচাই করে এলাম। সত্যি ঘটনা। সন্দেহ রইল না, নটবর তাদের ব্ল্যাকমেলা করছিল।'

'কিন্তু–রাসবিহারী বনবিহারী–এরা কারা? এদের কোথায় খুঁজে পাবে?'

'বেশি দূর খুঁজতে হবে না, এই মেসের তিন নম্বর ঘরে তাঁদের পাওয়া যাবে।'

'অ্যাঁ। রামবাবু আর বনমালীবাবু!'

'হ্যাঁ। তুমি কাছাকাছি আন্দাজ করেছিলে। ওরা মাসতুত ভাই নয়, সাক্ষাৎ সহোদর ভাই। তবে যদি চোরে চোরে মাসতুত ভাই এই প্রবাদ-বাক্যের মর্যাদা রাখতে চাও তাহলে মাসতুত ভাই বলতে পার।'

'কিন্তু–কিন্তু–এরা তো নটবর নস্করকে খুন করতে পারে না। নটবর যখন খুন হয় তখন তো ওরা—'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ধৈর্য ধারণ কর। আগাগোড়া কাহিনী আজ চায়ের সময় শুনতে পাবে।'

মাড়োয়ারীর দোকানের রকমারি ভাজা ভুজি ও চা দিয়া অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথমে দেখা দিলেন ভূপেশবাবু। ধুতি পাঞ্জাবির উপর কাঁধে পাট-করা ধূসর রঙের শাল, মুখে উৎসুক হাসি। বলিলেন, 'ব্রিজ খেলার ব্যবস্থা আছে নাকি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনারা যদি খেলতে চান ব্যবস্থা করা যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে রামবাবু ও বনমালীবাবু আসিলেন। গায়ে গলাবন্ধ কোট, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন আসুন।'

পানাহারের সঙ্গে ব্যোমকেশ সরস বাক্যালাপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করিলাম, রামবাবু ও বনমালীবাবুর আড়ষ্ট ভাবে শিথিল হইয়াছে। তাঁহারা সহজভাবে কথাবাতায় যোগ দিতেছেন।

মিনিট কুড়ি পরে জলযোগ সমাপ্ত করিয়া রামবাবু চুরুট ধরাইলেন; ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুকে সিগারেট দিয়া সিগারেটের টিন বনমালীবাবুর সামনে ধরিল, 'আপনি একটা নিন, বনবিহারীবাবু।'

বনমালীবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে, আমি সিগারেট খাই না–বলিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেলেন—'আজ্ঞে—আমার নাম—'

'আপনাদের দুই ভায়েরই প্রকৃত নাম আমি জানি-রাসবিহারী এবং বনবিহারী বিশ্বাস।'–ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে গিয়া বসিল, 'নটবর নস্কর আপনাদের ব্ল্যাকমেল করছিল। আপনারা মাসে মাসে তাকে আশি টাকা দিচ্ছিলেন–'

রাসবিহারী ও বনবিহারী দারুমুর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ নিজে সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'নটবর নস্কর লোকটা ছিল অতি বড় শয়তান। যখন ঢাকায় ছিল তখন প্রকাশ্যে দালালির কাজ করত, আর সুবিধা পেলে ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা চালাত। আপনারা দুই ভাই যখন জেলে গেলেন তখন সে ভবিষ্যতের কথা ভেবে

আদালতের রায়ের নকল যোগাড় করে রাখল। মতলব, আপনারা জেল থেকে বেরিয়ে আবার যখন চাকরি-বাকরি করবেন তখন আপনাদের রক্ত শোষণ করবে।

'তারপর একদিন দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল। ঢাকায় নটবরের ব্যবসা আর চলল না, সে কলকাতায় পালিয়ে এল। কিন্তু এখানে তার জানা-শোনা লোকের সংখ্যা কম, বৈধ এবং অবৈধ কোনো রকম ব্যবসারই সুবিধে নেই, ব্ল্যাকমেল করার উপযুক্ত পোত্র নেই। তার ব্যবসায় ভাঁটা পড়ল। এই মেসে এসে একটা ঘর নিয়ে সে রইল; সামান্য যা টাকা সঙ্গে আনতে পেরেছিল তাই দিয়ে জীবন নির্বাহ করতে লাগিল।

'এখানে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন সে আপনাদের দেখল এবং চিনতে পারল। আপনারা এই মেসেই থাকেন। খোঁজখবর নিয়ে সে জানতে পারল যে আপনারা ছদ্মনামে এক ব্যাঙ্কে চাকরি করছেন। নটবর নস্কর রোজগারের একটা রাস্তা পেয়ে গেল। ভগবান যেন আপনাদের হাত-পা বেঁধে তার হাতে সঁপে দিলেন।

'নটবর আপনাদের বলল, টাকা দাও, নইলে ব্যাঙ্কে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দেব। আপনারা নিরুপায় হয়ে মাসে মাসে টাকা গুনতে লাগলেন। টাকা অবশ্য বেশি নয় , মাসে আশি টাকা। কিন্তু নটাবরের পক্ষে তাই বা মন্দ কি। অন্তত মেসের খরচটা উঠে আসে।

'এইভাবে চলছিল। আপনাদের প্রাণে সুখ নেই, কিন্তু নটবরের হাত ছাড়ানোর উপায়ও নেই। একমাত্র উপায়, যদি নটবরের মৃত্যু হয়।'

ব্যোমকেশ থামিল। রুদ্ধশ্বাস নীরবতা ভাঙিয়া বনবিহারী হাউমাউ করিয়া উঠিলেন, 'দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আমরা নটবর নস্করকে মারিনি। নটবর যখন মরে তখন আমরা ভূপেশবাবুর ঘরে ছিলাম।'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়ে ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িল, অবহেলাভরে বলিল, 'কে নটবরকে খুন করেছে তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। মাথা-ব্যথা পুলিসের। কিন্তু আপনারা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। ব্যাঙ্কে যদি কোনো দিন টাকার গরমিল হয় তখন আমাকে আপনাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে হবে।'

এবার রামবাবু ওরফে রাসবিহারীবাবু কথা বলিলেন, 'ব্যাঙ্কের টাকার গরমিল হবে না। আমরা একবার যে-ভুল করেছি। দ্বিতীয়বার সে-ভুল করব না।'

'ভাল কথা। তাহলে আমি আর অজিত নীরব থাকব।' ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি?'

ভূপেশবাবুর মুখে বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল, তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'আমিও নীরব। আমার মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুবে না।'

অতঃপর ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর রামবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আপনাদের দয়া জীবনে ভুলব না। আচ্ছা, আজ আমরা যাই, আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছে।'

'আসুন। ' ব্যোমকেশ তাঁহাদের দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিল, তারপর দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

ভূপেশবাবু ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন দেখিলাম। ব্যোমকেশও প্রত্যুত্তরে হাসিল। ভূপেশবাবু বলিলেন, 'রামবাবু আর বনমালীবাবুর সঙ্গে নটবর নস্করের অবৈধ যোগাযোগ আছে আমি জানতাম না, ব্যোমকেশবাবু। ওটা সমাপতন। আপনি বোধ হয় সবই বুঝতে পেরেছেন–কেমন?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সব বুঝতে পারিনি, তবে মোট কথা বুঝেছি।'

ভূপেশবাবু বলিলেন, 'আপনি তাহলে গল্পটা বলুন। আমার যদি কিছু বলবার থাকে আমি পরে বলব।'

ব্যোমকেশ ভূপেশবাবুকে একটি সিগারেট দিল, নিজে একটি ধরাইয়া আমার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তুমি নটবরের মৃত্যুর একটা বিবরণ লিখেছি। সেটা পড়ে আমার খটকা লাগল। পিস্তলের আওয়াজ এত জোরে হয় না; এ যেন ছররা

বন্দুকের আওয়াজ, কিম্বা বোমা ফাটার আওয়াজ। অথচ নটবর মরেছে পিস্তলের গুলিতে।

‘রামবাবু এবং বনমালীবাবুর মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য তুমি লক্ষ্য করেছিলে। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম তাঁরা কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। নটবরের ঘরে তাঁদের যাতায়াত ছিল, সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে আমার মনে কৌতূহল হল।

‘কিন্তু যখন বন্দুকের আওয়াজ হয় তখন ওঁরা দোতলায় ভূপেশবাবুর ঘরে ছিলেন। ভূপেশবাবুর ঘরের পরিস্থিতি আতিশয় নিরুদ্বেগ ও স্বাভাবিক। তিনি নিজের ঘরে আছেন, ছ’টা বেজে পঁচিশ মিনিটে রাসবিহারী ও বনবিহারী তাস খেলতে এলেন। কিন্তু অজিত না আসা পর্যন্ত তাস খেলা আরম্ভ হচ্ছে না। দুমিনিট পরে সিঁড়িতে অজিতের ফট্‌ফট্‌ চটির শব্দ শোনা গেল। ভূপেশবাবু উঠে গিয়ে গলির দিকের জানলা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলিতে দুম করে শব্দ হল। রাসবিহারী ও বনবিহারী জানালার কাছে গেলেন। ভূপেশবাবু বলে উঠলেন, ‘ঐ-ঐ–গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামী রঙের আলোয়ান–?’

‘গলির মুখের কাছে সদর রাস্তা দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল, রাসবিহারী ও বনবিহারী তাদেরই একজনকে দেখে ভাবলেন সে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সন্দেহ রইল না যে, ভূপেশবাবু ঠিক কথাই বলছেন। তাঁদের বিশ্বাস হল যে, তাঁরাও লোকটাকে গলি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। এই ধরনের ভ্রান্তি চেষ্টা করলে সৃষ্টি করা যায়।

'পরে নটবরের ঘরের জানলার ওপর পিস্তলটা পাওয়া গেল। স্বভাবতাই প্রশ্ন জাগে, আততায়ী পিস্তলটা ফেলে গেল কেন? অস্ত্র ফেলে যাওয়ার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। আমার সন্দেহ হল এই সহজ স্বাভাবিক পরিস্থিতির আড়ালে মস্ত একটা ধাপ্পাবাজি রয়েছে।

'মেসের চাকর হরিপদ সন্ধ্যে ছাঁটার সময় শুনেছিল নটবরের ঘরে লোক আছে। যদি সেই লোকটাই নটবরকে খুন করে থাকে? এবং নিজের অ্যালিবই তৈরি করার জন্যে মৃত্যুর সময়টা এগিয়ে এনে থাকে? পনেরো কুড়ি মিনিটের তফাত ময়না তদন্তে ধরা পড়ে না।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, খুন যে-ই করুক, সে বাইরের লোক নয়, মেসের লোক। কিন্তু লোকটা কে? শিবকালীবাবু? রাসবিহারী-বনবিহারী? কিম্বা অন্য কেউ। কার মোটিভ আছে জানি না, কিন্তু সুযোগ আছে একমাত্র শিবকালীবাবুর। অন্য সকলের অকাট্য অ্যালিবাই আছে।

'মনটা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে রইল, কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ্য করেছিলাম যে, ভূপেশবাবুর ঘরের নীচে নটবরের ঘর এবং গলির দিকে ভূপেশেবাবুর জানলার নীচে নটবরের জানলা। কিন্তু পটকার কথা একেবারেই মনে আসেনি। হ্যাঁ, পটকা। যে পটকা আছাড় মারলে কিম্বা উঁচু থেকে শক্ত মেঝের উপর ফেললে আওয়াজ হয়। সেই পটকা।

'আজ সকালে থানায় যাচ্ছিলাম, যদি থানায় গিয়ে কিছু নতুন খবর পাই এই আশায়। বেরুবার সময় মনে হল, দেখি তো গলির মধ্যে নটবরের জানলার কাছে কোনো চিহ্ন পাই কিনা।

'চিহ্ন পেলাম। ঠিক নটবরের জানলার নীচে ইট-বাঁধানো মেঝের ওপর পাটকা ফাটার পাশুটে দাগ। শুঁকে দেখলাম অল্প বারুদের গন্ধও রয়েছে। আর সন্দেহ রইল না। চমৎকার একটি অ্যালিবাই সাজানো হয়েছে। কে অ্যালিবাই সাজিয়েছে? ভূপেশবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ তিনিই জানলা খুলেছিলেন। রাসবিহারী এবং বনবিহারী জানলার কাছে এসেছিলেন আওয়াজ হওয়ার পরে।

'সেদিন সন্ধ্যে ছাঁটার সময় ভূপেশবাবু অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গিয়েছিলেন। পিস্তল আগে থাকতেই যোগাড় করা ছিল, তিনি নটবরের ঘরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে গুলি করলেন। গলির দিকের জানলা খুলে দিয়ে সেখানে পিস্তল রেখে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ভাগ্যক্রমে কেউ তাঁর যাতায়াত দেখতে পেল না। কিন্তু যদি কেউ দেখে ফেলে থাকে তাই অ্যালিবাই দরকার। তিনি নিজের ঘরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ মিনিট পরে রাসবিহারী ও বনবিহারী তাস খেলতে এলেন। কিন্তু অজিত তখনো আসেনি, তাই তিনজনে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'তারপর ভূপেশবাবু সিঁড়িতে অজিতের চটির ফট্‌ফট্‌ শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তৈরি ছিলেন, তাঁর মুঠোর মধ্যে ছিল একটি মার্বেলের মত পটকা। ঘরের বন্ধ হাওয়ার অজুহাতে তিনি গলির দিকের জানলা খুলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুঠি থেকে পটকাটি

জানলার বাইরে ফেলে দিলেন। নীচে দুম করে শব্দ হল। রাসবিহারী ও বনবিহারী ছুটে জানলার কাছে গেলেন; ভূপেশবাবু তাঁদের বাদামী আলোয়ান গায়ে কাল্পনিক আততায়ী দেখালেন।

'তারপর ভূপেশবাবুকে আর কিছু করতে হল না; স্বাভাবিক নিয়মে যথাসময়ে লাশ আবিষ্কৃত হল। পুলিস এল, লাশ নিয়ে চলে গেল। যবনিকা পতন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। ভূপেশবাবু এতক্ষণ নির্বাত নিষ্কম্প বসিয়া শুনিতেছিলেন, এখনো নিশ্চল বসিয়া রছিলেনন। ব্যোমকেশ তাঁহার পানে ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিল, 'কোথাও ভুল পেলেন কি?'

ভূপেশবাবু এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ভুল পাইনি। ভুল আমিই করেছিলাম, ব্যোমকেশবাবু। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম আপনি ফিরে আসতে আসতে নটবরের মামলা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, বলিল, 'দুটো প্রশ্নের উত্তর পাইনি। এক, আপনার মোটিভ কি। দুই, পিস্তলের আওয়াজ চাপা দিলেন কেমন করে। বন্ধ ঘরের মধ্যে পিস্তল ছুড়লেও আওয়াজ বাইরে যাবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আপনি কি কোনো সতর্কতাই অবলম্বন করেননি?'

'দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দিচ্ছি'–ভূপেশবাবু কাঁধ হইতে পাট-করা শাল লইয়া দুই হাতে আমাদের সামনে মেলিয়া ধরিলেন; দেখিলাম নুতন শালের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'এই শাল গায়ে জড়িয়ে নটবরের ঘরে গিয়েছিলাম, শালের ভিতর হাতে পিস্তলছিল। নটবরকে শালের ভিতর থেকে গুলি করেছিলাম; গুলির আওয়াজ শালের মধ্যেই চাপা পড়েছিল, বাইরে যেতে পারেনি।'

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'আর প্রথম প্রশ্নের উত্তর? আমি কতকটা আন্দাজ করেছি; কাল আপনি ছেলের ফটো দেখিয়েছিলেন। যাহোক, আপনি বলুন।'

ভূপেশবাবুর কপালের শিরা দপদপ করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সংযত স্বরেই বলিলেন, 'ছেলের ফটো দেখিয়েছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সত্য আবিষ্কার করবেন। তাই আগে থেকে নিজের সাফাই গেয়ে রেখেছিলাম। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা বাধে সেদিন নটবর আমার ছেলেকে স্কুল থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যের পর সে আমার বাসায় এসে বলল, দশ হাজার টাকা পেলে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারে। নগদ দশ হাজার টাকা আমার কাছে ছিল না; যা ছিল সব দিলাম, আমার স্ত্রী গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিলেন। নটবর সব নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আমি ছেলেকে ফিরে পেলাম না। নটবরের দেখাও আর পেলাম না। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে, আমি স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে কলকাতায় চলে এসেছি, হঠাৎ একদিন রাস্তায় নটবরকে দেখতে পেলাম। তারপর-?

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। আর বলবার প্রয়োজন নেই, ভূপেশবাবু।'

ভূপেশবাবু কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া শেষে বলিলেন, 'এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কি করতে চান?'

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র কোথায় যেন একবার বলেছিলেন, 'দাঁড় কাক মারলে ফাঁসি হয় না।' আমার বিশ্বাস শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'